ইউনিট-৪ বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রশাসন

Constitution and Administration of Bangladesh

ভূমিকা

সংবিধান হ'ল কোন রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। রাষ্ট্রের দর্শনস্বরূপ এই মূল আইনে নিহিত থাকে নির্বাহীগণের অভিষেক প্রক্রিয়া, পরিচালক ও পরিচালিতের সম্পর্ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, নাগরিকগণের অধিকারের সীমারেখা, আইন প্রণয়ণের পদ্ধতি ইত্যাদি। মোট কথা, কোন রাষ্ট্র নিজেকে পরিচালিত করার জন্য যে পথ বেছে নেয় তা-ই সংবিধান। এারিস্টেটলের মতে রাষ্ট্র মনোনীত জীবন পদ্ধতিই হল সংবিধান। লিখিত আইন-কানুন ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক ও লোকায়ত আচার এতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সংবিধানের উদ্ভব ও প্রবর্তন বিভিন্নভাবে হ'তে পারে। যথা ঃ ঐশী নির্দেশের অভিব্যক্তির দ্বারা, বিবর্তনের দ্বারা, সামরিক বিজয়ের দ্বারা ও গণতান্ত্রিক কার্যব্যবস্থার দ্বারা ইত্যাদি।

একটি ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ দেশে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে নিয়ে গঠিত এই গণপরিষদ বিভিন্ন দেশের সংবিধান যাচাই করে অবশেষে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য একটি লিখিত সংবিধান গ্রহণ করে এবং তা একই বছর ১৬ ডিসেম্বর তারিখে বলবৎ হয়। সংবিধানে একটি প্রস্ত্রাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ৪টি তফসিল সন্নিবেশিত ছিল। দুষ্পরিবর্তনীয় এই সংবিধান বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশে গণতান্ত্রিক ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কয়েকটি মূলনীতি বিবৃত হয় এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও নাগরিকগণের জন্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের ব্যক্ত ইচ্ছার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান রাখা হয় উৎকৃষ্ট এই সংবিধানে।

কালের পরিসরে সংবিধানে নানাবিধ পরিবর্তন, পুনঃপরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। সংবিধানের অবয়বগত পরিবর্তন হ'য়েছে অনেক। ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রবর্তনের পর বর্তমানে সংবিধানে ভাগ, অনুচ্ছেদ ও তফসিলের সংখ্যা যথাক্রমে ১২, ১৬৫ ও ৩।

এই ইউনিটে বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সেই সাথে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হবে। আলোচনা নিম্নরূপ পাঁচটি পাঠে বিন্যস্ত হবে ঃ

- *পাঠ-১ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।*
- *পাঠ-২ বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার।*
- *পাঠ-৩ ন্যায়বিচার ও ন্যায়পাল।*
- *পাঠ-৪ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণতন্ত্র।*
- *পাঠ-৫ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও স্থানীয় সরকার।*

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

পাঠ-১

Fundamental Principles of State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কী তা বলতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের সংবিধানে বিবৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

রাষ্ট্র একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রয়োজন ও আশা-আকঙ্খা বাস্তবায়নের জন্যই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। তাই একে পরিচালনা করার জন্যও বিশেষ বিশেষ মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানেও অনুরূপ নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পাঠে সে সব নীতিমালা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য হ'ল মানুষের কল্যাণ ও জীবনমানের উন্নতি সাধন।

মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট ও বিকশিত হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাষ্ট্র হ'ল সবচেয়ে বেশী ব্যাপ্তিশীল ও শক্তিশালী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রও একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যানুযায়ী কর্মকান্ড নির্বাহ করে। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হ'ল মানুষের কল্যাণ ও জীবনমানের উন্নতি সাধন। এর দ্বারা যে কোন সমাজের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের অপ্রতিহত সুযোগ সৃষ্টিকে বোঝানো যায়। মূলনীতি বা basic principle বলতে কোন প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করার জন্য গৃহীত বা অনুসৃত দিকনির্দেশক অনুশাসনকে বোঝায়। যে সব মৌলিক দর্শন রাষ্ট্রপরিচালনায় দিকদর্শন হিসেবে কাজ করে সেগুলিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে। আধুনিক রাষ্ট্রে এরূপ মূলনীতিসমূহ সাধারণতঃ লিখিত অবস্থায় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধান উৎকৃষ্টরূপে লিখিত। এর "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" শিরোনামযুক্ত দ্বিতীয় ভাগে এসব মূলনীতি লিখিত হয়েছে। প্রস্ড়াবনায় বাংলাদেশের জনগণের অঙ্গীকার হিসেবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের অর্থে সমাজতন্ত্রকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা বলে গণ্য করা হয়েছে। তাই এ সব আদর্শকে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে দীক্ষিত বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ভিত্তি হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার "মূলনীতি" শিরোনামযুক্ত দ্বিতীয় ভাগের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে বর্ণিত নীতি এবং তার সাথে এই [দ্বিতীয়] ভাগে বর্ণিত অন্যান্য নীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হবে। সর্বশক্তিমান আল-াহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাষ্ট্রের কার্যাবলীর ভিত্তি হবে। বাংলাদেশ পরিচালনার এবং আইনের ব্যাখ্যাদানের মূলসূত্র হিসেবে এ সব নীতিমালা নির্দেশক হলেও আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হবে না। এখন রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে প্রধান প্রধান নীতিগুলিকে উলে- খ করা হল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস

বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ও কর্তৃত্বের উপর বিশ্বাস মানুষের জন্য আধ্যাত্মিক চেতনার বিষয়। পঞ্চম সংশোধনীর পর সংবিধানে এই বিশ্বাসকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অগ্রগণ্য মূলনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের সব কার্যাবলী পরিচালনা করা হবে বলে অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে (অনুঃ ৮)।

জাতীয়তাবাদ : রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা ও দেশকে ভালোবাসার মূল সূত্র হ'ল জাতীয়তাবাদ। ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত মূল সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছিল যে, ভাষাগত ও কৃষ্টি একক সত্তাবিশিষ্ট বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত পঞ্চম সংশোধনী অনুসারে অনুচ্ছেদটি পরিপূর্ণভাবে বদলে গেছে। এই সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে, দেশপ্রেম হ'ল জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে সকল কর্মকান্ডের মূল অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যুক্ত করা হয়।

গণতন্ত্র : গণতন্ত্র এমন একটি রাষ্ট্রদর্শন যেখানে মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা নিশ্চিত হয়। ব্যক্তি মানুষের সর্বাধিক মর্যাদা দানকারী এই দর্শনের আওতায় সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অভিব্যক্ত জনমত অনুসারে রাষ্ট্রের কাজকর্ম নির্বাহ করার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে (অনু: ৮ ও ১১)। গণতন্ত্র ত্রুটিহীন ব্যবস্থা না হলেও অন্যান্য সকল ব্যবস্থার বিপরীতে এটিই হল সবচেয়ে কম ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই কারণে বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গণতন্ত্র সমাদৃত।

সমাজতন্ত্র : অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের উপায়স্বরূপ 'সমাজতন্ত্র' নামক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি (অনু: ৮)। সংবিধানের এ সংক্রান্ড় বর্তমান বিধান মূল সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে বিধৃত 'সমাজে উত্তরণের অঙ্গীকার হতে গুণগতভাবে পৃথক। সংশোধন-পূর্ব মূল সংবিধানে তদানীন্তন বিশ্বব্যবস্থায় প্রবল আবেদন সৃষ্টিকারী আদর্শ 'সমাজতন্ত্র'কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম দিকদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় 'সমাজতন্ত্র'কে এখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অঙ্গীকারের অর্থে সংজ্ঞায়িত করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সীমিত করা হয়েছে।

জীবনের সকল সম্ভবনার স্ফুরণে রাষ্ট্র উলে- খযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে আত্তীকৃত সংবিধানের এই চারটি মূলনীতি ছাড়াও সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য মূলনীতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। রাষ্ট্র জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের পরিচালনায় গণতান্ত্রিকভাবে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাহ এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্ড়রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। উৎপাদন ব্যবস্থার সবকিছুই জনগণের মালিকানাধীন বলে গণ্য করে সংবিধান গুরুত্বের ক্রমানুযায়ী সম্পদের রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানা নির্দেশ করেছে (অনুঃ ১৩)। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করে সংবিধান জনগণের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ, কর্মসংস্থান, বিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে (অনুঃ ১৪-১৫)। কৃষি বিপ্লব সংঘটন, গ্রামোন্নয়ন শহরের সাথে গ্রামের জীবনযাত্রার বৈষম্য দূরীকরণের কথাও ব্যক্ত হয়েছে (অনু ঃ ১৬) এ সংবিধানে।

রাষ্ট্র সম্ভাব্য ন্যনতম সময়ে নিরক্ষরতা দুরীকরণ, যুক্তিযুক্ত স্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং বাস্তবানুগ শিক্ষাব্যবস্থা ও উপযুক্ত নাগরিক সৃজনে যত্নবান হবে (অনুঃ ১৭)। জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ক্ষতিকর উপকরণ, গণিকাবৃত্তি, জুয়া ইত্যাদি রোধকল্পে ব্যবস্থাগ্রহণ (অনুঃ ১৮) এবং মানুষের সুযোগের সমতাবিধান ও অসাম্য বিলোপের চেষ্টা করা হবে (অনুঃ ১৯)।

নাগরিকের জন্য অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় হিসেবে কর্ম মহিমান্বিত হবে এবং অনুপার্জিত সম্পদ ভোগের সুযোগ বিলোপ করা হবে (অনুঃ ২০)। নাগরিকগণ সভ্য জীবনের অনুসরণে সংবিধান ও শৃংখলার অনুবর্তী হবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ জনগণের সেবায় সকল সময়ে সচেষ্ট থাকবেন (অনুঃ ২১)। রাষ্ট্র বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হ'তে পৃথক করবে (অনুঃ ২২)।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের চেষ্টা ছাড়াও জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে রাষ্ট্র জনগণের অংশগ্রহণ এবং জাতীয় স্মৃতি নিদর্শনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে (অনুঃ ২৩-৪)। এছাড়া, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, আর্ন্তজাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদ ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও আত্মবিকাশের জন্য সব জাতির মহান অধিকারের সপক্ষে ও নিপীড়নের বিপক্ষে ভূমিকা রাখবে। ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশ-সমূহের সাথে জোরদার ভাতৃত্ব গড়ার চেষ্টা করা হবে বলেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ব্যক্ত হয়েছে (অনুঃ ২৫)।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধানে বিঘোষিত মূলনীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য না হ'লেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবন নির্বাহ করা এবং আইন প্রণয়ন ও আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে এসব মূলনীতি নির্দেশক সূত্র হিসেবে কাজ করে। জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও মনোভাবের বিমূর্ত অভিব্যক্তিস্বরূপ এ সব মূলনীতি আমাদের সাধারণ অঙ্গীকার।

সংশোধনীসমূহ:

বাংলাদেশের সংবিধানের এখন পর্যন্ড় ১৩টি সংশোধনী বলবৎ হয়েছে। এগুলোর কোন কোনটি আকারে বিরাট ও চরিত্রে ভাবগম্ভীর। এগুলোর আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য। তাই

এখানে শুধু এ সব সংবিধান সংশোধন আইন প্রবর্তনের সময় ও এগুলোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য দু'একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম : ১৯৭৩ সাল। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণমূলক জঘন্য অপরাধের কঠিন শাস্তির প্রতিবিধান।

দ্বিতীয় : ১৯৭৩ সাল। কঠিনতর আইনের ও জরুরি ঘোষণা বলবৎ করার বিধান সম্বলিত এই সংশোধনীর দ্বারা দেশে নাগরিক অধিকার কিছু মাত্রায় খর্ব করার সুযোগ সৃষ্ট হয়।

তৃতীয় : ১৯৭৪ সাল। রাষ্ট্রীয় সীমানা পুনর্বিন্যাসের স্বীকৃতিজ্ঞাপক এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন সীমান্তরেখা পুন:সংজ্ঞায়িত করার জন্যে প্রণীত চুক্তিকে বৈধতাদান করা হয়।

চতুর্থ : ১৯৭৫ সাল। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও একদলীয় শাসন প্রবর্তন। দেশের শাসন পদ্ধতিতে আকস্মিক ও ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা হয় এর মাধ্যমে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা ও একদলীয় শাসন প্রবর্তিত হয় এই সংশোধনীর মাধ্যমে। এছাড়াও নাগরিক অধিকারও সীমিত হয়ে পড়ে এর দ্বারা।

পঞ্চম : ১৯৭৯ সাল। সামরিক শাসন বৈধকরণ, মূলনীতি পরিবর্তন ও একদলীয়ব্যবস্থার অবসান। সামরিক শাসনের মাধ্যমে ১৯৭৫-৭৯ সময়ে দেশ পরিচালনার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থাবলীকে অনুমোদন করা হয়।

ষষ্ঠ : ১৯৮১ সাল। উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনযোগ্য পদের যোগ্যতাদান। উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগযোগ্য হলেও তাকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যাক্তিরূপে নির্বাচনযোগ্য পদের যোগ্যতা হারাতে হবে না বলে বিধান করা হয়।

সপ্তম : ১৯৮৬ সাল। সামরিক আইন বৈধকরণ। ১৯৮২-১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ে সামরিক আইন বলবত থাকাকালে গৃহীত সকল ব্যবস্থাকে এই সংশোধনী দ্বারা বৈধতা দেয়া হয়।

অষ্টম : ১৯৮৮ সাল। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয় এই সংশোধনীতে।

নবম : ১৯৮৯ সাল। উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির রানিংমেট করার বিধান সম্বলিত এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি-উভয় পদকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

দশম : ১৯৯০ সাল। মহিলা সদস্যগণের আসন সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি। বিধান করা হয় যে মোটামুটিভাবে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ে জাতীয় সংসদে ৩০ জন মহিলা সদস্য পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

একাদশ : ১৯৯১ সাল। প্রধান বিচারপতিকে উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ করানোর বিধান সম্বলিত এই সশোধনী মূল সংবিধানকে স্পর্শ করেনি। তবে ১৯৯০ সালের সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের যে অসাংবিধানিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিলো তাকে সংবিধানের সমর্থন দেয়া হয়।

দ্বাদশ : ১৯৯১ সাল। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন সম্বলিত এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনী কর্তৃক সাধিত রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা হতে সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রবর্তন করা হয়।

ত্রয়োদশ : ১৯৯৬ সাল। সংসদ ভেঙে গেলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার বিধান-সম্বলিত এই সংশোধনীর মাধ্যমে স্থায়ী সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখা হয় যে, সংসদ ভেঙ্গে গেলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সময় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে দেশে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্রিয়াশীল থাকবে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চর্তুদশ: ২০০৪ সাল। চতুর্দশ সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে স্পীকার অথবা ডেপুটি স্পীকার সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করাতে অসমর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কশিনার শপথ পাঠ করানোর বিধান করা হয়। জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৪৫-এ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫টি আসন হবে সংরক্ষিত মহিলা আসন। এই ৪৫টি বর্ধিত আসনে মনোনীত নারী প্রার্থীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আওতায় সাধারণ আসনের সংখ্যানুপাতে নারী আসনগুলো ভাগ করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর, পিএসসির চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছর এবং মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অবসর বয়সসীমা ৬০ থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয় ১৯৭২ সালের .....
(ক) ২৬ মার্চ তারিখে;
(খ) ১৭ এপ্রিল তারিখে;
(গ) ৪ নভেম্বর তারিখে;
(ঘ) ১৬ ডিসেম্বর তারিখে।

২। বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ রয়েছে .....
(ক) ১৫২টি;
(খ) ১৫৩টি;
(গ) ১৬৪টি;
(ঘ) ১৬৫টি।

৩। "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" শিরোনামযুক্ত অংশটি সংবিধানের .....
(ক) প্রথম ভাগ;
(খ) দ্বিতীয় ভাগ;
(গ) তৃতীয় ভাগ;
(ঘ) চতুর্থ ভাগ।

৪। সংবিধানে গুরুত্বের ক্রমানুযায়ী সম্পদের মালিকানার ধরণ .....
(ক) সমবায়ী, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত;
(খ) রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী;
(গ) ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী;
(ঘ) রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত।

৫। সংবিধানে মুসলিম দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের ভাতৃত্ব জোরদার করার ভিত্তি হিসেবে বর্ণিত হ'য়েছে ...
(ক) জাতিসংঘ সনদ;
(খ) জোটনিরপেক্ষ নীতিমালা;
(গ) ইসলামী সংহতি;
(ঘ) অনাক্রমণ।

৬। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হ'তে পৃথক করার সাংবিধানিক অঙ্গীকার ব্যক্ত হ'য়েছে .....
(ক) ৮ অনুচ্ছেদে;
(খ) ১২ অনুচ্ছেদে;
(গ) ১২২ অনুচ্ছেদে;
(ঘ) ২২ অনুচ্ছেদে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ বিস্ড়ারিতভাবে আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ
পাঠ-১ ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। গ ৬। ঘ

সহায়ক গ্রন্থঃ
১. *Alamgir, Development Strategy for Bangladesh, Dhaka: University of Dhaka, 1980*

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার
Fundamental Rights in Bangladesh Constitution

পাঠ-২

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি —

- ◆ মৌলিক অধিকার কি তা বলতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকার বিবৃত করতে পারবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যে সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার মধ্যে মৌলিক অধিকার বিষয়ক বিধানাবলী অগ্রগণ্য। বর্তমান পাঠে এ সব বিধান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য কতিপয় অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় এ সব সুযোগ-সুবিধার অভাবে জীবনধারণ কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। জীবনের উন্নতি হয়ে যায় রুদ্ধ। এ সব সুযোগ-সুবিধার সাধারণ নাম মৌলিক অধিকার। আধুনিক বিশ্বে প্রায় সকল সভ্য সমাজে এসব অধিকারের মহিমা উচ্চকিত হয়েছে। মৌলিক অধিকার হ'ল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নিশ্চয়তাসম্পন্ন সেইসকল অপরিহার্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা যা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগণ স্ব স্ব সত্তার বিকাশ সাধন ও মানবজীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৬ থেকে ৪৭ক পর্যন্ত ২৩ টি অনুচ্ছেদে ব্যাপ্ত তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার বিষয়ক বিধানাবলী বিদ্যমান। এই ভাগের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, সংবিধান সংশোধনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রণীত আইন ছাড়া অন্য কোন আইনে মৌলিক অধিকারের ব্যত্যয় ঘটানো হ'লে সে সব আইন পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল হবে (অনুঃ ২৬)।

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমানভাবে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী।

সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের প্রত্যেককে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী বলে ঘোষণাপূর্বক সংবিধান ব্যক্ত করেছে যে, নাগরিকদের মধ্যে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তে বৈষম্য করা হবে না। তবে নারী, শিশু ও সমাজের অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির নিমিত্তে বা সরকারী কর্ম লাভে তাদেরকে সহায়তাদানের নিমিত্তে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও বিশেষ প্রকৃতির অন্যান্য কাজে নিয়োগ-সংরক্ষণের নিমিত্তে ব্যতিক্রমী বিধান প্রবর্তনের সুযোগ থাকবে (অনু-ঃ ২৭-২৯)। আরো বিধৃত হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যাতিরেকে কোন নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে উপাধি, পুরস্কার ইত্যাদি গ্রহণ করবেন না (অনুঃ ৩০)।

সংবিধানের এই ভাগের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্তের অধিবাসীদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ বা আইনানুগ ব্যবহার লাভের অবিচ্ছেদ্য অধিকার থাকবে এবং আইনের অধীনে ছাড়া কোন ব্যক্তির সুযোগ বা সম্পত্তির হানি ঘটানো যাবে না। আইনের অধীনে ছাড়া কোন ব্যক্তির জীবন বা ব্যক্তি স্বাধীনতার খর্ব করা যাবে না। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হবে এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া উক্ত ব্যক্তিকে ততোধিক কাল আটক রাখা যাবে না। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে তার গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে এবং তাকে তার মনোনীত আইনজীবির পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। শুধু নিবর্তনমূলক আটকের অধীন ব্যক্তির জন্য এরূপ অধিকার কিছু মাত্রায় খর্ব হতে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রেও একটি উপযুক্তরূপে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পর্ষদের সুপারিশ ব্যতীত কাউকে ছয়মাসের বেশী কাল আটক রাখা যাবে না (অনুঃ ৩১-৩৩)।

ফৌজদারী অপরাধের দন্ড ও বিশেষ প্রয়োজনে আইনানুযায়ী আহুত কর্ম ব্যতীত যে কোন বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ থাকবে। অপরাধ সংঘটনকালে বিদ্যমান আইনে নির্ধারিত দন্ডের অতিরিক্ত দন্ড দেয়া যাবে না বা এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার বিচার করা যাবে না। কাউকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। সাধারণতঃ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের

ব্যবস্থা থাকবে এবং নিষ্ঠুর, লাঞ্ছনাদায়ক ও অমানবিক দন্ড বা আচরণ পরিহার করা হবে (অনুঃ ৩৪-৩৫)।

জনস্বার্থে আইনানুগভাবে আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বাংলাদেশে বসবাস, চলাফেরা, বহির্গমন ও প্রত্যাবর্তন এবং সমাবেশ ও শোভাযাত্রা বা সংগঠনে যোগদানের অধিকার থাকবে। চিন্ড্রা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। অনুরূপভাবে বৈধ পেশা বা বৃত্তিতে লিপ্ত হবার অধিকার ও পছন্দমত ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার নিশ্চিত থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না (অনুঃ ৩৬-৪১)।

আরো বলা হয়েছে যে, আইনানুগ বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে নাগরিকগণ সম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও বিলি-ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং সম্পত্তি দখল করতে হ'লে আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণসহ তা করা যাবে। আইনানুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশ ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ বা তল্লাশী করা বা তাকে আটকানো যাবে না। চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তার অধিকার হ'তে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না (অনুঃ ৪২-৪৩)।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য নাগরিকগণ হাইকোর্ট বিভাগের নিকট বা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য আদালতের নিকট মামলা করতে পারবেন। শৃংখলা বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত শৃংখলামূললক আইন বা বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের বিধান কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করবে না। আবার, মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে অথবা দেশাভ্যন্ড়রে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কাজ বা গৃহীত ব্যবস্থাকে সংসদের আইন অনুযায়ী বৈধ হিসেবে গণ্য করে নেয়া যাবে (অনুঃ ৪৪-৪৬)।

মৌলিক অধিকার বিষয়ক ভাগের শেষ প্রান্তে দু'টি (৪৭ ও ৪৭ক) হেফাজতকরণমূলক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশকরতঃ বিধান করা হয়েছে যে, সংবিধানের মূল নীতি ও মৌলিক অধিকার বিষয়ক বিধান সত্ত্বেও সম্পত্তি, কারবার, ব্যবসায়, পেশা ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার থাকবে। এই অধিকার সংসদের আইন দ্বারা প্রযুক্ত হবে এবং এরূপ আইন প্রয়োজনমত সংশোধনের সুযোগ থাকবে। আবার গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ইত্যাদির কারণে কোন বাহিনীর সদস্য বা যুদ্ধবন্দীকে আটক, দন্ডদান ইত্যাদির জন্য প্রণীত কোন আইনের বিধান সংবিধানের অনুশাসনের নিরীখে বাতিল বা বেআইনী বলে গণ্য হবে না। সবশেষে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এরূপ আইন যার প্রতি প্রযোজ্য তিনি সাংবিধানিক প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন না। এ ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী ব্যক্তিবর্গকে দমনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিষয়ক অংশ হ'ল .....
(ক) দ্বিতীয় ভাগ;
(খ) প্রস্ড়াবনা;
(গ) তৃতীয় ভাগ;
(ঘ) তৃতীয় তফসিল।

২। সংবিধান যাদের অগ্রগতির নিমিত্তে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রাখেনি তারা হ'লেন .....
(ক) নারী;
(খ) শিশু;
(গ) সমাজের অনগ্রসর অংশ;
(ঘ) বৃদ্ধ।

৩। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হ'লে তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজির করতে হয় .....
(ক) নিকটবর্তী থানায়;
(খ) নিকটতম কারাগারে;
(গ) নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট;
(ঘ) জেলা জজের আদালতে।

৪। নিবর্তনমূলক আটকের বিধানযুক্ত আইনের অধীনে কাউকে উপযুক্তরূপে গঠিত পর্ষদের সুপারিশ ব্যতীত আটক রাখা যায় সর্বোচ্চ .....
(ক) ত্রিশ দিন;
(খ) চার মাস;
(গ) ছয় মাস;
(ঘ) ৩১০ দিন।

৫। অপরাধের কারণে শাস্তিদানের সময় কোন কোন অবস্থায় আরোপ করা সম্ভব .....
(ক) নিষ্ঠুর দন্ড;
(খ) বাধ্যতামূলক শ্রমদন্ড;
(গ) লাঞ্ছনাদায়ক সাজা;
(ঘ) অমানবিক দন্ড।

৬। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য নাগরিকগণ মামলা দায়ের করতে পারেন .....
(ক) মানবাধিকার আদালতে;
(খ) বিশেষ আদালতে;
(গ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে;
(ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আদালতে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মৌলিক অধিকার কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ ৫। খ ৬। গ

পাঠ-৩

ন্যায়বিচার ও ন্যায়পাল
Justice and Ombudsman

উদ্দেশ্য

পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ ন্যায়বিচার কী-তা বলতে পারবেন।
- ◆ ন্যায়বিচার ও শাস্তির বিভিন্ন প্রকার মতবাদ বিবৃত করতে পারবেন।
- ◆ ন্যায়পাল নামক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় নানা জটিল ও বিচিত্র দিকসমূহ বিবেচনায় ক্রমশঃ বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। এগুলোর মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থাদি বিশেষতঃ ন্যায়পাল নামক একটি প্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান পাঠে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

ন্যায়বিচার

সুসভ্য মানব জীবনের মূল ভিত্তি হ'ল ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা ও নিষ্ঠা। মানুষ একাকী জীবনধারণ করলে অন্যের সাথে তার মিথষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রসংগও গুরুত্ব পায় না। কিন্তু মানুষের পক্ষে একাকী সমাজ বর্হিভূত জীবনযাপন অসম্ভব। তাই সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের স্বার্থে মানুষকে একে অপরের প্রতি ন্যায্য আচরণের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত পূরণ করতে হয়। সমাজ সৃষ্টির মূলেই রয়েছে সমষ্টির প্রয়োজনের আলোকে ব্যক্তির প্রয়োজনকে সমন্বিত করা। এ থেকে উদ্ভুত হয়েছে ন্যায়বিচারের ধারণা। সভ্য মানুষ অপরের প্রতি কী আচরণ প্রদর্শন করবেন এবং বিনিময়ে অন্যের নিকট হ'তে কী আচরণ প্রত্যাশা করবেন তা নিয়মিত, বাধাহীন ও সুসভ্যভাবে স্থির করার জন্য ন্যায়বিচারের উদ্ভব।

সুশৃংখল ব্যবস্থাধীনে নিরাপত্তা ও স্বস্বির সাথে জীবনধারণ এবং সুশোভন প্রক্রিয়ায় স্ব স্ব জীবনের বিকাশ সাধনের অধিকার সকল মানুষেরই আছে। সকলকে এই অধিকার ভোগের সামর্থ্য প্রদানের ব্যবস্থা শুধু ন্যায়বিচারভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাতেই পাওয়া সম্ভব। এর আওতায় প্রত্যেকে যেমন নিজের প্রাপ্য অধিকার অক্লেশে পেতে পারেন, তদ্রুপ কেউ কারো অধিকারের সীমারেখায় অযাচিত হস্তক্ষেপ করেন না। অন্যের অধিকারভঙ্গের বা ক্ষতিসাধনের কারণে দায়ী ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি বা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ন্যায়বিচারের নিরীখে অত্যাবশ্যক। আইন, নৈতিকতা ও সাধারণ বিবেচনাবোধের আলোকে অনুশীলিত ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজের শৃংখলা ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আধুনিক ব্যবস্থায় আইনের ব্যাখ্যার আলোকে দুই প্রকৃতির ন্যায়বিচার ক্রিয়াশীল ঃ দেওয়ানী ও ফৌজদারী। জীবনের অন্তর্নিহিত সম্পদ ও ভৌত সম্পত্তির অধিকার হ'তে কাউকে অন্যায্যভাবে বিচ্যুত করা হলে তিনি আইনের ব্যাখ্যার আলোকে যথাযথ আদালত হ'তে প্রাতিষ্ঠানিক দেওয়ানী ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করতে পারেন। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তিতে অন্য কেউ ক্ষতিসাধন করলে উক্ত ব্যক্তি ও সেই সাথে তার সমাজ একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন বলে বিবেচিত হয়। তখন উক্ত অপরাধমূলক কাজের জন্য উপযুক্ত প্রতিবিধান করা ফৌজদারী ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী ন্যায়বিচারের অপরাধের শাস্তি বিধানের পেছনে যুক্তিগুলো হচ্ছে- প্রতিশোধমূলক, দৃষ্টান্তমূলক, নিবৃত্তিমূলক, ক্ষতিপূরণমূলক এবং সংশোধনমূলক

সামাজিক শৃংখলা রক্ষার মাধ্যমে সমাজের ইস্পিত বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী ন্যায়বিচারের বা অপরাধের শাস্তিবিধানের পেছনে কয়েকটি যুক্তি রয়েছে ঃ

প্রতিশোধমূলক (Retributive)

বর্বর জীবন থেকে উত্তরণের পর এইসব অনুভুতি সভ্যতার প্রথম পাদ হতে প্রায় অক্ষুণ্নভাবে প্রবহমান। কারো জীবন ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কাজের কারণে উক্তরূপ কাজের হোতাকে সমরূপ বা এমনকি কঠোরতর ক্ষতির সম্মুখীন করার এটি একটি মানবীয় প্রবণতা। 'নাকের বদলে নাক' -এরূপ প্রকৃতির এই মনোভাবটি অপরাধের প্রতিবিধান সংক্রান্ত ন্যায়বিচার শাস্ত্রে ক্রমশঃ কমজোর হ'য়ে চলেছে।

দৃষ্টান্তমূলক (Deterrent)

অপরাধমূলক কাজের কারণে কঠিন সাজা আরোপিত হবার বাস্তব সম্ভাবনার কথা জানা থাকলে সম্ভাব্য অপরাধী অপরাধ করা হতে বিরত থাকবে বলে এই মতবাদে আশা করা হয়। জঘন্য অপরাধের কারণে মৃত্যুদন্ডের বিধান এ ধরণের আরো অপরাধ সংঘটনকে কার্যকরভাবে নিরুৎসাহিত করে।

নিবৃত্তিঃ (Preventive)

প্রমাণিত অপরাধী কর্তৃক অনুরূপ বা জঘন্যতর অধিক অপরাধ সংঘটনের সুযোগ বন্ধ করার জন্য এসব অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করা হয়।

ক্ষতিপূরণমূলক (Compensatory)

অপরাধকর্মের হোতা অপরাধমূলক কাজের মাধ্যমে যাতে লাভবান না হ'তে পারে বা অনুরূপ কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ড় মানুষের ক্ষতি যাতে কিছু পরিমাণে হলেও লাঘব হয়, সেজন্য এই মতবাদ ক্রিয়াশীল। দেখা যায় যে, প্রমাণিত অপরাধীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তার সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ উক্ত অপরাধের শিকার নিরীহ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

সংশোধনমূলক (Corrective)

অপরাধীরা সমাজের বোঝা ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সংশোধনের মাধ্যমে এদের ক্ষতিকর প্রবণতা দূরীকরণ ও কল্যাণকর সম্ভাবনার উজ্জীবন এই মতবাদের উদ্দেশ্য। অপরাধীকে অসুস্থ হিসেবে গণ্য ক'রে সমাজদেহ হ'তে এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্যই অপরাধীদেরকে সংশোধন কেন্দ্রে নেয়া হয়। পাশ্চাত্যের বিত্তবান দেশগুলিতে বিশেষতঃ নবীন বয়সের অপরাধীকে এরূপ সংশোধনের জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হ'য়েছে।

প্রচলিত আইন ও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা যুক্তি যুক্তভাবে অতিক্রম করার জন্যে যথাবিহীত নির্দেশ দানের ক্ষমতা সম্পন্ন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানই ন্যায়পাল।

কোন সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু স্বয়ংক্রিয় বা সততঃ পরিচালিত ব্যবস্থা থাকে। মানুষের মননগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক মূল্যবোধ, আইনের উপযুক্ততা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদির যথার্থতা-- এর সবগুলি নিয়ামকই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের যেমন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট স্বভাব আছে, তেমনি আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যধারায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা আছে। প্রচলিত আইন ও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা যুক্তিযুক্তভাবে অতিক্রম করার জন্য আধুনিক বিশ্বে ন্যায়পাল নামক একটি প্রতিষ্ঠান দেশে দেশে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ন্যায়পাল

দেওয়ানী ও ফৌজদারী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি স্থাপন ও জীবনমানের উন্নতিসাধনের কাজে রাষ্ট্র সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের এই মহান দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের দ্বারা নির্বাহ করা হয়। এ সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কর্মকর্তাগণের সঠিক মনোভাব ও কর্মকুশলতা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ ও শাসন ব্যবস্থার ইস্পিত মান যাতে যথাযথভাবে নিশ্চিত হয় তা পরিবিক্ষণের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ সঠিকভাবে দায়িত্বপালন করছেন কি না তা পর্যালোচনাপূর্বক যথাবিহীত নির্দেশদানের ক্ষমতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানই ন্যায়পাল।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে ন্যায়পাল নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ১৮০৯ সালে সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অন্যান্য নরডিক দেশে (যথা - ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও আইসল্যান্ডে) প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত বিকাশলাভ করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশে 'ন্যায়পাল' সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন দেশে প্রায় অভিন্নার্থক এই প্রতিষ্ঠানটি 'ন্যায়পাল' ছাড়াও অন্যান্য নাম পরিগ্রহ করে। এরূপ দু'একটি প্রতিষ্ঠানের নাম উলে- খ করা যায় ঃ-

অস্ট্রিয়া	ঃ	Volksanwaltschaft
ফ্রান্স	ঃ	Mediateur de la Republique
লিথুয়ানিয়া	ঃ	Seimas Ombudsman
নেদারল্যান্ড	ঃ	Nationale Ombudsman
পোল্যান্ড	ঃ	Commissioner for Civil Rights Protection
পর্তুগাল	ঃ	Provedor de Justica
রুশ ফেডারেশন	ঃ	High Commissioner for Human Rights
শ্লোভেনিয়া	ঃ	Human Rights Ombudsman
স্পেন	ঃ	Defensor del Pueblo
যুক্তরাজ্য	ঃ	Parliamentary Commissioner for Administration

জাম্বিয়া ঃ Chief Investigator.

কোন কোন দেশে জাতীয় এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক ন্যায়পাল থাকেন, আবার কোন কোন দেশে আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন ন্যায়পালও আছেন। কোন কোন দেশে বিষয়-ভিত্তিক এখতিয়ারসম্পন্ন ন্যায়পালও দেখতে পাওয়া যায়।

ন্যায়পাল কর্তৃক কৃত কোন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ন্যায়পাল আদালতের মর্যাদা পরিগ্রহণ করে।

ন্যায়পাল নাগরিকদের প্রেরিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বা এমন কি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান বা অফিসের কার্যক্রম বা বিশেষ কোন কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, ন্যায়পাল আদালতের বিচারাধীন কোন বিষয়ের উপর অনুসন্ধান হ'তে বিরত থাকেন। ন্যায়পাল কর্তৃক কৃত কোন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ন্যায়পাল আদালতের মর্যাদা পরিগ্রহ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ৭৭) 'ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠার বিধান করে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পাল সৃষ্টি করতে পারবে। জাতীয় সংসদ ১৯৮০ সালের ১৫ নং আইন (ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০) প্রবর্তন করে। বলা হয় যে, জাতীয় সংসদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন ন্যায়পাল থাকবেন।

সুপরিচিত প্রশাসনিক দক্ষতা ও সততা বিবেচনাক্রমে জাতীয় সংসদের সুপারিশ অনুযায়ী নিযুক্ত ন্যায়পাল তিন বৎসর মেয়াদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রযোগে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন, কিংবা সংসদে অন্যান দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সমর্থিত প্রস্তাবক্রমে তিনি অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হ'তে পারেন।

সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্মকর্তার আচরণের উপর ন্যায়পাল তদন্ত করতে পারবেন। তবে, দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয়ে তদন্ত করা চলবে না। তদন্ড়াধীন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায়পাল দেওয়ানী কার্যবিধি ও দন্ডবিধির বিধান মোতাবেক একটি আদালতের মর্যাদা ভোগ করবেন এবং অনুরূপ আদালতের মত কার্যধারা অবলম্বন করতে পারবেন।

তদন্ড় শেষে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কারো প্রতি অবিচার করা হয়েছে, তাহলে ন্যায়পাল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেবেন। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার কাজের দ্বারা কাউকে অন্যায়ভাবে লাভবান করা হয়েছে, তাহলে এ জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষেত্রমত আইনগত, বিভাগীয় বা শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ন্যায়পালকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করবে। গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হলে ন্যায়পাল সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট একটি বিশেষ রিপোর্ট পেশ করতে পারবেন।

ন্যায়পাল তার কার্যক্রমের উপর প্রতিবছর একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন যা রাষ্ট্রপতির ব্যাখ্যামূলক স্মারকসহ জাতীয় সংসদে প্রেরিত হবে। এই আইন অনুযায়ী তদন্ড়কালে কোন আইনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে ন্যায়পাল সেই ত্রুটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বিবেচনামত সুপারিশ করতে পারেন।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজের জন্য ন্যায়পাল বা তার কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলবে না। ন্যায়পালের কোন কার্যধারা, সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে ন্যায়পাল আইনের এখতিয়ার-বর্হিভূত বলে ঘোষণা করতে পারবেন। সবশেষে, ন্যায়পাল আইন ছাড়াও নাগরিকগণের জন্য দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনের অধীনে প্রাপ্য ন্যায়বিচার দাবী করার অধিকার বজায় থাকবে।

স্বাধীনতার ত্রিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশে এখনও ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয় নি। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ইপ্সিত সেবামূলক কার্যাবলী, জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীগণের জবাবদিহি ও সর্বোপরি সরকারী প্রশাসনব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র ন্যায়পাল পদে নিয়োগদান বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত ন্যায়পাল নিয়োগের পর তাঁকে আইনানুগভাবে কাজ করতে দিলে দেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, জবাবদিহি ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। সম্প্রতি ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে বলে জানা গেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। অপরাধের শাস্তিবিধানের পিছনে সবচেয়ে আদর্শস্থানীয় মতবাদটি হ'ল ... .
(ক) প্রতিশোধমূলক;
(খ) দৃষ্টান্তমূলক;
(গ) ক্ষতিপূরণমূলক;
(ঘ) সংশোধনমূলক।

২। ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব হয় .....
(ক) সুইডেনে;
(খ) আইসল্যান্ডে;
(গ) ফিনল্যান্ডে;
(ঘ) নেদারল্যান্ডে।

৩। বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান আছে .....
(ক) ৮ অনুচ্ছেদে;
(খ) ৭৭ অনুচ্ছেদে;
(গ) ৫৮ অনুচ্ছেদে;
(ঘ) ১১৬ অনুচ্ছেদে।

৪। ন্যায়পাল পদ হ'তে অপসারণের পদ্ধতি হ'ল .....
(ক) সংসদের উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে অনুমোদিত প্রস্তাবক্রমে
(খ) বাধ্যতামূলক ছুটির নির্দেশ দিয়ে;
(গ) ৫৭ বছর বয়স পূর্ণ হ'লে অবসর দিয়ে;
(ঘ) তাঁর দপ্তর বিলুপ্ত করে।

৫। ন্যায়পাল পদে নিয়োগদানের আইনগত সুযোগ সুষ্টি হয়েছে .....
(ক) ১৯৭৯ সালে;
(খ) ১৯৮০ সালে;
(গ) ১৯৮১ সালে;
(ঘ) ১৯৯৬ সালে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ন্যায়বিচার কি?
২. বাংলাদেশের সংবিধানে 'ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ন্যায়বিচার ও শাস্তির বিভিন্ন প্রকার মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. 'ন্যায়পাল' নামক প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ

১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। খ

পাঠ-৪

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও গণতন্ত্র

Caretaker Government and Democracy

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- তত্ত্বাবধায়ক কি তা বলতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানতে পারবেন।

তত্ত্বাবধায়ক বা 'Caretaker' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি একটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। দৈনন্দিন জীবনে তত্ত্বাবধায়ক কথাটির এরূপ অর্থসম্পন্ন অসংখ্য উদাহরণ চোখে পড়ে। এই অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হল একটি বিশেষ ধরণের অস্থায়ী সরকার। ব্যবহারিক রাজনীতির আধুনিক পরিভাষায় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' পদটি ক্রমেই একটি শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার হল সংক্ষিপ্ত মেয়াদে গঠিত ও কার্যকর অস্থায়ী সরকার যা বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার হ'ল একটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদে গঠিত ও কার্যকর অস্থায়ী সরকার যা নিয়মিত সরকারের পরিবর্তে বিশেষ কোন দায়িত্বপালন শেষে নতুন সরকারের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর পূর্বক দৃশ্যপট হতে অপসৃত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে এ ধরণের সরকার প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত বিধান লিপিবদ্ধ আছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী সন্নিবেশিত নতুন ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ অনুচ্ছেদসমূহ এবং ইষৎ সংশোধিত ৬১ অনুচ্ছেদের বিধানের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বিষয়াবলীর মূলকথা নিহিত।

সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা মেয়াদ শেষে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যভার গ্রহণের পর হতে সংসদ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ পর্যন্ড় সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট যৌথভাবে দায়ী একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনধিক দশ জন উপদেষ্টা থাকেন। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পনেরো দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণের সাধারণ যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ

- সংসদ-সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা;
- অনধিক বাহাত্তর বছর বয়স;
- কোন রাজনৈতিক দলের বা দলীয় অংগসংগঠনের সদস্য না হওয়া;
- সংসদ-সদস্যগণের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে লিখিত সম্মতি প্রদান।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য অধিকতর শর্ত হ'ল এই যে, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা অনুরূপ ব্যক্তির অসামর্থ্যের বা অসম্মতির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বে যিনি উক্ত পদ হতে অবসর নিয়েছেন তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে। এদু'জনের অসামর্থ্য বা অসম্মতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক হিসেবে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা তাঁর অসামর্থ্য বা অসম্মতির ক্ষেত্রে একই পদে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে। সম্ভাব্য এই ব্যক্তিগণের সকলের অসামর্থ্য বা অসম্মতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যথাসম্ভব প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনাক্রমে উপদেষ্টা হবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে কাউকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। তাতেও সফল না হলে রাষ্ট্রপতি নিজেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। উপদেষ্টাগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত হ'ল, তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী নিযুক্ত হবেন। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত ও স্বাক্ষরিত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন। তাছাড়া, উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্তির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা হারালেও উপদেষ্টার পদ শূন্য হবে।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্র্ড়বর্তীকালীন সরকার হিসাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহায়তায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদন করবে। দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রয়োজন ছাড়া এই সরকারের দ্বারা কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না। শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেমনটা প্রয়োজন, নির্দলীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনকে তেমন সকল সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের যে সব সাংবিধানিক বিধান আছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে সে সব বিধান কার্যকর থাকবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে দেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা সম্পর্কিত আইন-কানুন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সংবিধানে বিস্তারিত বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে ১৯৯৬ সালে প্রবর্তিত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। আরো অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও সাধারণ নির্বাচনসমূহ নিয়মিত সরকারের অধীনে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সংশয় প্রকাশ করা হয়। অনুমিত হয় যে, দলীয় সরকারের পক্ষে নির্বাচনের ফলাফলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার জন্য সরকারী অবস্থান ও সম্পদের অপব্যবহার এবং বলপ্রয়োগের মত অনিয়ম সংঘটিত হয়ে থাকে। বিরোধী পক্ষও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়। ফলে নির্বাচন হয়ে ওঠে শক্তিপ্রয়োগ, চাতুরী ও বিশৃংখলার অনাকাংখিত এক উৎসবের মত। সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতির পাশাপাশি প্রকৃত জন-ইচ্ছার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচনী ফলাফলও পরিলক্ষিত হয়। এতে নির্বাচন ব্যবস্থা ও সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতার হানি ঘটে। এরূপ অনভিপ্রেত অবস্থা পরিহারের লক্ষ্যে জনগণের প্রবল দাবী ও উত্তাল গণআন্দোলনের ফলে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন সরকার জাতীয় সংসদে সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯৬ পাশ করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। আশা করা যায়, সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচনে সব ধরনের অপপ্রভাব দূরীকরণের পথে এটি একটি সফল পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

গণতন্ত্র একটি সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জনগণের সম্মতি ও ইচ্ছার আলোকে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনগণের অভিপ্রায় নির্ণয়ের জন্য বিশদ বিধি-বিধানের মধ্যে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অন্যতম। কোন বিষয় বা ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে জনগণের মতামত এরূপ ভোটাধিকারের অনুশীলনের মাধ্যমে নির্ণীত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রদত্ত মতই সঠিক মত বলে পরিগণিত হয়। তবে সংখ্যালঘুর প্রদত্ত মতামতকে নির্বিকার উপেক্ষা করার পরিবর্তে যুক্তিযুক্তভাবে সম্মান করার তাগিদ থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এ জন্য বলা হয় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের একাধিপত্য বা স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হবার আশংকা থাকলেও জনমত-অনুসারী শ্রেয়তর কোন শাসনপদ্ধতির কথা জানা নেই।

গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মানবসত্তা প্রকৃষ্টভাবে মহিমান্বিত হয়। মানুষের প্রতি আবশ্যিক ভালোবাসা ও মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা হ'ল গণতন্ত্রের নির্দেশক নীতি। ফরাসী বিপ- বের দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহান প্রত্যয়ের প্রত্যেকটিই গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় দর্শন। প্রত্যেক মানুষ কিছু মৌলিক বিবেচনায় একে অপরের সমান - এই বিশ্বাসে গণতন্ত্র সমষ্টির মত নিরূপণের জন্য সকল মানুষের স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত মতামতকে বিবেচনায় আনে। সম্পদগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্ত্রী-পুরুষভেদ ইত্যাদি দিকগুলো এ ক্ষেত্রে আমলে নেয়া হয় না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জনহিতকর কাজকর্মের প্রয়োজনে ও মানুষের বাধাহীন ইচ্ছার প্রতিভূ হিসেবে বেছে নেয়া প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হয়।

কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণের অভিব্যক্ত ইচ্ছার অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা হওয়ায় গণতন্ত্র জনমতের প্রতি সর্বদাই সংবেদনশীল। কিন্তু জনমত অতি দ্রুত বদলাতে পারে। তাই নিত্যনৈমিত্তিক এই পরিবর্তনধারা মনে রেখে আধুনিক সভ্যতার ধারকগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর জনমত যাচাই এবং তদনুযায়ী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদে চার বছরের জন্য, কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধি সভার সদস্য পদে দুই বছরের জন্য এবং কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ বা সিনেটের সদস্য পদে ছয় বছরের জন্য কাউকে নির্বাচিত করা হয়। ভারত, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি রাষ্ট্রে পার্লামেন্টের সদস্যগণ পাঁচ বছর মেয়াদে নির্বাচিত হন। তেমনিভাবে বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদের সদস্য পদে সংশি- ষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

জনসাধারণের অভিব্যক্ত ইচ্ছার অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা হওয়ার গণতন্ত্র জনমতের প্রতি সর্বদাই সংবেদনশীল।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ-সদস্যগণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থিত সদস্য প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রায় সকল মন্ত্রী তাঁদের মধ্য হতে নিযুক্ত হন, স্থানীয় উন্নয়নের উদ্যোগ কার্যকর করতেও তাঁরা নির্দেশনা দান করেন। এসব বিবেচনায় সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন যাতে ত্রুটিমুক্ত ও জনমতের সত্যিকার

প্রতিফলনকারী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক সরকার ব্যবস্থা মূলতঃ রাজনৈতিক দলীয় সরকার ব্যবস্থা। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে সরকার গঠনকারী ও সরকারের বিরুদ্ধাচারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতভেদ বা সংঘাতের পরিবেশ বিদ্যমান। ফলে নির্বাচন ব্যবস্থায় অনভিপ্রেত চাপ সৃষ্টি করে ইচ্ছামত নির্বাচনী ফলাফল আদায় করার একটি প্রবণতা বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন মহলের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এতে জনগণের মতামত ও মর্যাদা যেমন উপেক্ষিত হয়, তেমনি তিক্ত বিতর্কের পটভূমিতে অবিশ্বাস ও সংঘর্ষের মত ঘটনাও ঘটতে পারে। এরূপ অবস্থা হতে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসেবে একটি অর্ন্তবর্তীকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে এরূপ একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমন্বয়ে গঠিত তিনটি রাজনৈতিক জোটের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রবল গণআন্দোলনের ফলে জেনারেল এরশাদের জনসমর্থনহীন স্বৈর সরকারের পতনের পর প্রধানতঃ সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় এই সরকার। সফলভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নিয়মিত সংসদীয় সরকার গঠিত হবার সাথে সাথেই এই অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে কিন্তু নির্বাচন সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটনের সুযোগ ও আশংকা সমাজে বিরাজ করতে থাকে। ফলে, সংসদ-সদস্যগণের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় এগিয়ে এলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তা সম্পন্ন করার দাবী জোরালো হতে থাকে। একটি ঘটনাবহুল আন্দোলনের মাধ্যমে দাবীটি ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন সরকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রর্বতন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থাধীনে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংবিধানিকভাবে এখন সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচনসমূহ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত করার স্থায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এটি রাষ্ট্র পরিচালনার আধুনিক ব্যবস্থাপনায় একটি মাইলফলক স্বরূপ।

প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার কারণে সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্বাচকমন্ডলীর আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন থাকে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এই সরকারের শীর্ষ পদগুলোতে অধিষ্ঠিত থাকেন না বলে দলীয় স্বার্থে নির্বাচন পরিচালনার সুযোগ থাকে না। প্রতিদ্বন্দ্বী সব রাজনৈতিক দল মোটামুটি সমান সুবিধা পায় বলে জনমতকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করার সম্ভাবনাও কমে এসেছে। প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার কারণে সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্বাচকমন্ডলীর আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করলে রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সম্পদের অপচয় কমে আসে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর চাপ হ্রাস পায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এই যে, এরূপ সরকারের দ্বারা পরিচালিত সাধারণ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমতের প্রকৃত প্রতিফলনকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকার গঠন করে জনসেবা ও দেশগঠনের সুযোগ লাভ করছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষেও কতিপয় যুক্তি আছে। বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অর্থ নিছক নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠান করা নয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শুধু নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচনের সমার্থক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত নিয়মিত সরকারও যে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম- তা উপেক্ষা করা হয়। তৃতীয়ত, সাধারণ নির্বাচনের কাজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মের প্রয়োজনেও সমতূল্য সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী ওঠা অস্বাভাবিক হবে না। চতুর্থত, গণতন্ত্র কোন জনগোষ্ঠীর সমষ্টি ও ব্যক্তির সামাজিক ও মননগত একটি অবস্থা বিশেষ। মানুষের চেতনায় গণতন্ত্র থাকলেই প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র আসে, রাষ্ট্রে গণতন্ত্র আসে। কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতির ফলে জননেতাদের নিয়মনিষ্ঠতা ও দক্ষতার সাথে গণতন্ত্র শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ কমে যায়।

এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের অগ্রসর গণতন্ত্রের জন্য বাস্তব পূর্বশর্তগুলো বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে প্রধানতঃ অনুপস্থিত। ফলে এদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মত অর্ন্তবর্তীকালীন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারে থাকতে পারেন .....
(ক) একজন প্রধান উপদেষ্টা ও তিনি যেরূপ সংখ্যক পছন্দ করেন সেরূপ সংখ্যক উপদেষ্টা;
(খ) এক বা একাধিক প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টা;
(গ) একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনধিক দশজন উপদেষ্টা;
(ঘ) একজন প্রধান উপদেষ্টা ও পনেরো জন উপদেষ্টা।

২। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সাহায্য করেন.....
(ক) বেসামরিক প্রশাসনকে;
(খ) নির্বাচন কমিশনকে;
(গ) সশস্ত্র বাহিনীকে;
(ঘ) রাষ্ট্রপতিকে।

৩। সর্বোচ্চ ৭২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন .....
(ক) রাষ্ট্রপতি;
(খ) শুধু প্রধান উপদেষ্টা;
(গ) শুধু উপদেষ্টাগণ;
(ঘ) প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ।

৪। ফরাসী বিপ- বের দ্বারা মহিমান্বিত হয় নি .....
(ক) সাম্য;
(খ) মৈত্রী;
(গ) স্বাধীনতা;
(ঘ) সার্বভৌমত্ব।

৫। আধুনিক সরকার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মূলতঃ .....
(ক) স্বৈরতন্ত্র;
(খ) রাজনৈতিক দল ভিত্তিক;
(গ) কতিপয়তান্ত্রিক;
(ঘ) গণতান্ত্রিক।

৬। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কার্যকর থাকবে .....
(ক) সর্বক্ষণের জন্য;
(খ) আগামী চারটি নির্বাচনের মেয়াদে;
(গ) সংসদ ভংগ অবস্থায় সংসদ-সদস্যগণের প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের সময়;
(ঘ) রাষ্ট্রপতি যখন চাইবেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা বর্ণনা করুন।এর পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো কি?

উত্তরমালা

পাঠ-৪ ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ ৬। গ

সহায়ক গ্রন্থ

Mohammed A. Hakim, Bangladesh Politics: The Shahabaddin Interregnm, Dhaka: DPL, 1993

পাঠ-৫ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও স্থানীয় সরকার

Administrative Structure in Bangladesh and Local Government

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি —

- ◆ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কি তা বলতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্বরূপ বলতে পারবেন।
- ◆ দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

প্রশাসনিক কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্র। এর প্রশাসনিক কাঠামো সেই আলোকেই বিন্যস্ড়। গণতান্ত্রিক ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে এ দেশের প্রশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড ইপ্সিতভাবে পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল প্রশাসন ব্যবস্থা। এর কার্যকারিতার উপর রাষ্ট্রের কল্যাণ ও অকল্যাণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হ'তে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দর্শন সুদৃঢ়ভাবে অনুসৃত হবার ফলে এবং কতিপয় রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রশাসনের পরিধি ও গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলাহয়েছে।

এখন দেখা যাক, প্রশাসনিক কাঠামো বলতে কি বুঝানো হয়। রাষ্ট্র ও সরকার কম-বেশী বিমূর্ত প্রত্যয় বিশেষ। তবে, প্রজাতন্ত্রের অজস্র কর্মচারীকে সহজে দেখা ও চেনা যায়। জনসাধারণ তাদের কাছে যাওয়া-আসা করেন, যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাদের গৃহীত বা অগৃহীত ব্যবস্থাদির দ্বারা লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ড় হন। এ সব কারণে প্রজাতন্ত্রের এ সব কর্মচারী দেশের সমষ্টিক জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সার্বিক কর্মকাঠামোকে সাধারণতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে দেখা হয় ঃ আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ। এই নির্বাহী বিভাগের দ্বারাই সরকারের দৈনন্দিন শৃংখলামূলক, সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সিংহভাগ সম্পাদিত হয়। এ সব কাজে অন্য দু'টি বিভাগের কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণমূলক বা নির্দেশনামূলক ভূমিকা থাকলেও নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গই সরকারের এ সব কাজ সম্পাদনে মূল ভূমিকা পালন করেন। নির্বাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহের বিন্যাসকে সাধারণভাবে কোন দেশের প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশকে সাংবিধানিকভাবে একটি একক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। কাঠামোটি ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত ব্যবস্থার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি, ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার দু'টি প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আহরণ ও শৃংখলা রক্ষা। প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপ-মহাদেশের অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশেও প্রধানতঃ ব্রিটিশ শাসকদের প্রয়োজনে এক ধরনের ইস্ড়াত কাঠামো (Steel Frame) প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশদের প্রস্থানের পর পাকিস্তান আমলে এই ব্যবস্থায় সামান্যই পরিবর্তন হয়েছিল। আড়াই দশকের পাকিস্তানী শাসনের অবসান হয় একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হলেও কাঠামোর মৌলিক কোন হেরফের হয় নি। বিদ্যমান কাঠামোকে বিশ্লেষণ করলে এর বিন্যাস দেখতে পাওয়া যাবে। কাজের ধরন অনুসারে সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ দেশের আইনসভা। সংসদীয় গণতন্ত্র অনুযায়ী সংসদ প্রজাতন্ত্রের প্রধান নীতি-নির্ধারক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় বিভাগটি হ'ল সরকারের নির্বাহী অঙ্গ। নির্বাহী বিভাগ বহু সংখ্যক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যসূচক (functional) এজেন্সী সমন্বয়ে গঠিত হয়। তৃতীয়ত,

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতসমূহ নিয়ে গঠিত হয় বিচার বিভাগ। এ সব বিভাগের শীর্ষে অধিষ্ঠিত আছেন প্রজাতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি।

নির্বাহী বিভাগের অভ্যন্তরে মন্ত্রণালয়ের অধীনে কতিপয় দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ইত্যাদি থাকতে পারে। মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ সব প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্বাহী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটির আবার মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে শাখা বা স্থাপনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সরকারী কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। তাদের কর্মকৌশলের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে সরকারের পারদর্শিতা বিষয়ক ভাবমূর্ত্তি।

নির্বাহী বিভাগকে আবার আঞ্চলিক কর্মপরিধি (jurisdiction) অনুসারে ভাগ ভাগ করে এক একটি ইউনিটের সাথে মিলিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে। কোন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন হয় কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে - মন্ত্রণালয়সমূহে এই কাজ হয়। এর ঠিক নীচে আছে প্রশাসনিক বিভাগ। সারা দেশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট - এই ছয়টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরূপ বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব মন্ত্রণালয়ের অধস্তন অফিস বা শাখাসমূহ আছে। এ সব দপ্তর হ'তে আরো নিম্নস্তরে অবস্থিত অন্যান্য অফিসের কাজকর্ম তদারক বা তত্ত্বাবধান করা হয় এবং কিছু কিছু প্রশাসনিক সমস্যার নিরসন করা হয়।

প্রশাসনিক ইউনিট বা স্থানীয় সরকারের পরবর্তী স্তর হ'ল জেলা। সারা দেশে মোট ৬৪টি জেলা রয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের অফিস বা শাখা অবস্থিত। মাঠ পর্যায়ের মূল কাজকর্ম ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও ব্যবহারিক সমস্যাবলীর তাৎক্ষণিক সমাধানে লিপ্ত থাকে জেলা স্তরের দপ্তরগুলো। কোন কোন মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ের মূল কাজ নির্বাহ করা হয় জেলা স্তরেই। সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক জেলা স্তরের সরকারী কাজকর্মের সার্বিক সমন্বয় সাধন করেন। অতঃপর, মাঠপর্যায়ের অধস্তন স্তরটি হ'ল থানা। এই স্তরটি ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। প্রধানতঃ আইন-শৃংখলা রক্ষা, রাজস্ব আহরণ এবং কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে থানা ব্রিটিশ রাজত্বকাল হ'তেই অনন্য ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান আমলে এই স্ড়রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামাঞ্চলে তার ক্ষমতাভিত্তি ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়। সরকারী সম্পদের বিতরণ ও ব্যবহারের জন্য এই স্তরের প্রশাসনিক কাঠামোকে যথেষ্ট দক্ষ হিসেবে আবিষ্কার করা হয়। স্বাধীনতার পর কিছুদিন এই স্তরের প্রতি আগ্রহে ভাটা পড়ে। তবে, কিছুকাল পুর্বে 'উপজেলা' হিসেবে চিহ্নিত এই থানা স্তরে সরকারের মাঠপর্যায়ের অধিকাংশ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এখানে ক্রিয়াশীল দপ্তরগুলো প্রায় সব দেশগঠনমূলক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। মাঠ প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তরটি হ'ল ইউনিয়ন। জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ বা শহরাঞ্চলের পৌরসভা স্তরে স্বাস্থ্য ও কৃষির মত কতিপয় বিষয়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ নিজ নিজ বিভাগের কাজ করে থাকেন।

স্থানীয় সরকার

সরকারী সম্পদের বিতরণ ও ব্যবহারের জন্য থানা স্তরের প্রশাসনিক কাঠামো সবচেয়ে দক্ষ ও উপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

আধুনিক পৃথিবীতে জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার সকল কাজ নিজের হাতে সম্পাদন করে না। সরকারের ব্যাপক কাজ বিভিন্ন সংস্থা বা দপ্তরের অধস্তন শাখাগুলোর মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। গণতান্ত্রিক দর্শনের আলোকে জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবর্গের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেও কিছু নির্দিষ্ট কাজকর্ম সমাধা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে দেশগঠনমূলক কাজ বা উন্নত দেশে এমনকি শৃংখলামূলক কাজও এরূপ স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং স্থানীয় রাজস্ব আহরণ ও স্থানীয় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতাসম্পন্ন এরূপ জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানই স্থানীয় সরকার। কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের নিকট হ'তে কিছু কর্তৃত্ব বা কার্যাবলী বিযুক্ত করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানকে যদি আইন অনুযায়ী অর্পণ করা হয় তাহলে সেসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়।

তাহলে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারণা বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একটি মাত্র কেন্দ্র হ'তে সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া একাধিক কেন্দ্রে সঞ্চালনের প্রক্রিয়াই বিকেন্দ্রীকরণ। এটি বর্তমান কালের সামষ্ঠিক কর্মকান্ডে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব পাচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণকে তাই কয়েকটি রূপে দেখা যায়ঃ স্থানীয় প্রশাসন (Local Administration), বহুকেন্দ্রীকীকরণ (Deconcertration), হস্তান্তর (Devolution), চুক্তিভিত্তিক অর্পণ (Contracting-out), বেসরকারীকরণ (Privatization) ইত্যাদি। এর মধ্যে কর্তৃত্ব হস্তান্তর হ'ল বিকেন্দ্রীকরণের সর্বাধিক আলোচিত ও পরিচিত চিত্র। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এরূপ অবয়ব পাওয়ার জন্য প্রত্যাশী থাকে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। প্রাচীন ও মধ্যযুগের 'প্রশান্ত আত্মনির্ভর গ্রামগুলো' মূখ্যতঃ গ্রামপ্রধান ও সমাজের প্রাচীনগণের দ্বারা পরিচালিত হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে এদেশে আধুনিক স্থানীয় শাসনের সূত্রপাত হয়। ১৮৮৫, ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত বিভিন্ন আইন অনুযায়ী স্থানীয় এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কিছু কিছু ক'রে বৃদ্ধি পায় এবং এগুলোর গঠনেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ইউনিয়ন বোর্ড ও পরে ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রিক তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে এবং ভবিষ্যত প্রবাহের মূল বাহকে পরিণত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী আমলের ব্যবস্থাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য-এই উভয় পদে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধানসহ মোটামুটি অক্ষুণ্ন থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ-৯)। এ ছাড়াও সরকারের নির্বাহী অঙ্গের অন্যতম বাহু হিসেবে স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের গঠন, ক্ষমতা ও পরিধি সম্বন্ধেও ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয়েছে। সাংবিধানিক এ সব বাধ্যবাধকতা পূরণের লক্ষ্যে দেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের তেমন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি, অথবা অনুরূপ গৃহীত কিছু পদক্ষেপ অসফল হ'য়েছে। এমনকি সাংবিধানিক এ সকল বিধান ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় আচমকা বিলুপ্ত করে এক ধরণের শূন্যতা আনয়নের প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা গেছে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীর এই অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণের কোন সাফল্যজনক প্রবণতা শুরু করা হয় নি। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কালের পরীক্ষায় একথা বার বার স্পষ্ট হয়েছে যে, স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট জনগণকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন প্রচেষ্টা না নেয়া হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণের আলোচনা সব সময়েই প্রাসংগিক।

দেশে তৃণমূল পর্যায়ে অনেকটা অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির গ্রাম পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

দেশে তৃণমূল পর্যায়ে অনেকটা অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির 'গ্রাম পরিষদ' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তবে শতাব্দীপ্রাচীন যে প্রতিষ্ঠানটি গ্রামাঞ্চলে স্বমহিমায় টিকে আছে তা হ'ল ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি)। মোটামুটি পনেরোটির মত গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত। এতে একজন চেয়ারম্যান, নয়জন সাধারণ সদস্য ও তিনজন মহিলা সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এবং জাতীয় সরকারের প্রদত্ত অনুদান ছাড়াও নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করে। কতিপয় অপরাধের আইনানুগ বিচারের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম আদালতের দায়িত্ব পালন করে। গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ইউপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহরাঞ্চলে এসব ভুমিকা পালন করে পৌরসভা। শহরাঞ্চলের আয়তন, লোকসংখ্যা, অধিবাসীদের পেশা, অবকাঠামোগত অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় পৌরসভাগুলো 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণীতে বিভক্ত। এদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগরের জন্য একটি করে সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের কাজের পরিধি ও সম্পদের ব্যাপকতা সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

ইউনিয়ন পরিষদের উর্ধতন স্তর থানা পর্যায়ে ১৯৯১ সন পর্যন্ত প্রায় এক দশক সময়ে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ছিল উপজেলা পরিষদ। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত এই উপজেলা পরিষদে উপজেলাস্থিত ইউপি ও পৌরসভার চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান এবং মনোনীত মুক্তিযোদ্ধা এবং মহিলা প্রতিনিধিগণ ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য ছিলেন। এছাড়া উপজেলা পরিষদের নিকট প্রেষণে প্রেরিত জাতিগঠনমূলক সরকারী দপ্তরসমূহের অফিসপ্রধানগণ ছিলেন এর ভোটাধিকারবিহীন সদস্য। জাতীয় সরকারের দেয়া উন্নয়ন মঞ্জুরী ও নিজস্ব আহরিত সম্পদ দ্বারা উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করত। নবসৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ বৃদ্ধি ও জন-উপযোগ পূরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সমান্ড়রাল দু'টি দপ্তর জাতীয় সরকারের 'সংরক্ষিত বিষয়' হিসেবে উপজেলা স্তরে স্থাপন করা হয়। এ গুলো হ'ল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। ১৯৯২ সালে এই পদ্ধতিটি বাতিল করা হলে প্রতিনিধিত্বশীল এই পরিষদটির সম্ভাবনা আইনগতভাবে রুদ্ধ হ'য়ে যায়। উপজেলা পরিষদ বা অনুরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পুনরায় প্রবর্তনের জন্যে একটি আইন ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বিচার কাঠামো ও সংরক্ষিত বিষয়ের সংশ্রব ব্যতীত অন্যান্য বিধান বর্তমান আইনে সংস্থিত হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ বাতিল ঘোষিত হলে প্রতিনিধিত্বশীল এ পরিষদটির সম্ভবনা আইনগতভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় সরকারের জেলা স্তরের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও ধারাবাহিক পট পরিবর্তন ঘটে এসেছে। সর্বশেষ ১৯৮৯-৯০ সময়ে জেলা পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসেবে সরকারের উপমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন একজন আধিকারকে অধিষ্ঠিত করা হয়। বাংলাদেশের সমতলভূমিস্থ ৬১টির মধ্যে ৬০টি জেলায় তদানীন্ড়ন সরকার দলীয় একজন ক'রে সংসদ-সদস্যকে এই পদে বসানো হয়। জেলার সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভা চেয়ারম্যান ও কয়েকজন বাছাই করা ইউপি চেয়ারম্যান ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা ও মহিলাগণের প্রতিনিধিবৃন্দ জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য ছিলেন। জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক দপ্তরের প্রধানগণ ছিলেন এই পরিষদের সদস্য। সরকারী অনুদান, টোল ইত্যাদির মাধ্যমে আহরিত নিজস্ব তহবিল এবং ভূমি হস্তান্তর করের অংশবিশেষের মত নির্ধারিত আদায়ের অর্থ দ্বারা জেলা পরিষদ উন্নয়নমূলক কাজ করতো। উল্লেখ্য, এদেশের পল্লী অবকাঠামোর মূল ভিত্তিই জেলা পরিষদের দ্বারা স্থাপিত হয়। ১৯৯১ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির অঘোষিত অবসান ঘটানো হয়। বর্তমানে এই পর্যায়ে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। তবে একটি চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে শিগগিরই জেলা পরিষদ গঠনের প্রস্তুতি চলছে। খাগড়াছড়ি, বান্দরবন ও রাঙ্গামাটি জেলায় বিশেষ আইনের অধীনে সৃষ্ট তিনটি 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' ক্রিয়াশীল রয়েছে। মর্যাদায় উচ্চতর এই পরিষদ পাহাড়ী অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোকে সরকারী সম্পদ ও নির্দেশনার মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট। দেশ গঠনমূলক ২২টি দপ্তরের কাজ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই পরিষদের নিকট ন্যস্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। সংবিধানের মর্মানুযায়ী বাংলাদেশ একটি .....
(ক) যুক্তরাষ্ট্র;
(খ) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র;
(গ) মুসলিম রাষ্ট্র;
(ঘ) উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।

২। সরকারের আবশ্যকীয় বিভাগসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় .....
(ক) নির্বাহী বিভাগ;
(খ) বিচার বিভাগ;
(গ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;
(ঘ) আইন বিভাগ।

৩। উপ-মহাদেশে 'ইস্পাত কাঠামো' প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে .....
(ক) মোগল আমলে;
(খ) পাকিস্তান আমলে;
(গ) ব্রিটিশ আমলে;
(ঘ) মৌর্য শাসনামলে।

৪। বিকেন্দ্রীকরণের সমার্থক নয় .....
(ক) বহুকেন্দ্রীকীকরণ;
(খ) বিচ্ছিন্নতাবাদ;
(গ) বেসরকারীকরণ;
(ঘ) চুক্তিভিত্তিক অর্পণ।

৫। তদানীন্তন উপজেলা পরিষদের ভোটাধিকারবিহীন সদস্য ছিলেন .....
(ক) ইউপি চেয়ারম্যান;
(খ) পৌরসভা চেয়ারম্যান;
গ) দেশগঠনমূলক বিভাগের কর্মকর্তা;
(ঘ) মহিলা প্রতিনিধি।

৬। বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিবেচনাধীন স্থানীয় সরকারের প্রস্তাবিত কাঠামো .....
(ক) দ্বি-স্তরবিশিষ্ট;
(খ) ত্রি-স্তরবিশিষ্ট;
(গ) চার-স্তরবিশিষ্ট;
(ঘ) অনির্দিষ্ট।

উত্তর মালাঃ ১. খ, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ, ৫. গ, ৬. গ।

সহায়ক গ্রন্থ

এমাজউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪